বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জীবন

মিজানুর রহমান

এবছরের ২৫ আগষ্ট থেকে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী নতুন করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জাতিগত নিধনযজ্ঞ শুরু করে। যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাতে রোহিঙ্গাদের পক্ষে নিজ দেশ, ঘরবাড়ি, জীবনযাপন ছেড়ে অন্যদেশে পাড়ি দেয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। সবচেয়ে কম সময়ে সবচেয়ে বেশি মানুষের উদ্বাস্তু হওয়ার ঘটনা ঘটতে থাকে তখনই। বাংলাদেশেই তাঁদের আশ্রয়। নিজভূমি ত্যাগের পর বাংলাদেশে তাঁদের অবস্থা দেখে, কথা বলে এই লেখা। আলোকচিত্রশিল্পী লেখক নিজেই।

১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭। সকাল ৬টায় ঢাকা-কক্সবাজার বাস থেকে টেকনাফ লিংক রোডের মাথায় নেমে উখিয়ার উদ্দেশে লোকাল বাসে উঠলাম। পাশের সিটে নবীন নারী চিকিৎসক টেকনাফের কোনো এক হাসপাতালে নতুন যোগ দিয়েছেন। কক্সবাজারের মেয়ে। তাঁর কাছ থেকে রোহিঙ্গা বিষয়ে জানার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তিনি তেমন কিছু জানাতে পারলেন না। লোকাল বাস থেকে ঘণ্টাখানেক পর কক্সবাজার-টেকনাফ রোডের বালুখালীর একটা বাজারের সামনের রাস্তায় নামলাম। বাসের পেছনের দিকে বসার কারণে চলতি পথে রাস্তার চিত্র খুব একটা দেখা যায়নি। বাস থেকে নেমে যে অবস্থা আমার চোখে পড়ল, তা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। হাজার হাজার মানুষ অজানার পথে হাঁটছে। বহু মানুষ ত্রাণের গাড়ির পেছন পেছন ছুটছে ত্রাণের আশায়। রাস্তার দুই ধারে মানুষ আর মানুষ। শিশু-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ। অসুস্থ মানুষ রাস্তার ধারে পড়ে আছে। অনেক অসুস্থ মানুষ আবার আরেকজনের সাহায্য নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছার চেষ্টা করছে। এক শিশু আরেক শিশুকে কোলে নিয়ে প্রাণপণে আশ্রয়ের খোঁজে ছুটে চলছে। আবার অনেকে পরিবারের লোকজন নিয়ে রাস্তার পাশে বসে আছে। প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণার সাথে এসব দৃশ্য দেখছি এবং ছবি তুলছি। কিছু সময় পর পা, হাত, ক্যামেরা–কোনো কিছুই চলছিল না। অনেকক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। কোনো কিছুই ভাবতে পারছিলাম না। বেশ কিছুক্ষণ পর আবার হাঁটতে লাগলাম। শরণার্থীদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম, ভাষার সমস্যার কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি।

বাস থেকে নেমে যে অবস্থা আমার চোখে পড়ল, তা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। হাজার হাজার মানুষ অজানার পথে হাঁটছে। বহু মানুষ ত্রাণের গাড়ির পেছন পেছন ছুটছে ত্রাণের আশায়। রাস্তার দুই ধারে মানুষ আর মানুষ। শিশু-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ। অসুস্থ মানুষ রাস্তার ধারে পড়ে আছে। অনেক অসুস্থ মানুষ আবার আরেকজনের সাহায্য নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছার চেষ্টা করছে। এক শিশু আরেক শিশুকে কোলে নিয়ে প্রাণপণে আশ্রয়ের খোঁজে ছুটে চলছে। আবার অনেকে পরিবারের লোকজন নিয়ে রাস্তার পাশে বসে আছে।

আশ্রয়ের খোঁজে অনিশ্চিত যাত্রা

উখিয়ার সোনারপাড়া থেকে অটোরিকশায় অজান্তেই এক রোহিঙ্গা পরিবারের সহযাত্রী হয়ে গেলাম। তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিলাম যে তাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর লড়াই দেখব। সাত-আটজনের পরিবার। কোট বাজারে অটোরিকশার রাস্তা শেষ। এখান থেকে অন্য রাস্তার গাড়িতে উঠতে হবে। অটো ভাড়া দিতে পারছিল না। বুঝলাম তাদের কাছে তেমন কোনো টাকা নেই। খোঁজ নিয়ে জানলাম, কয়েক দিন ধরে পেটে তেমন কিছু দিতে পারেনি। সবাই ভয়াবহ ক্লান্ত, অসুস্থ। তাড়াতাড়ি রুটি, কলা, বোতলের পানি কিনে তাঁদের হাতে দিলাম, সাথে কিছু নগদ অর্থ। খাওয়ার তেমন সময় নেই। দ্রুত অজানা গন্তব্যে পৌঁছতে হবে। অটোওয়ালার সাথে দরদাম চলছে। এরই মাঝে একজন টুপি-দাঁড়িওয়ালা মানুষ রোহিঙ্গা পরিবারটির হাতে কিছু টাকা দিয়ে অটোওয়ালাকে বললেন–ভাড়া নিয়ো না, এরা কলেমাওয়ালা দ্বিনি ভাই। বুকে অসম্ভব কষ্ট নিয়ে তাঁদের সাথে চলছি। অটোর পথ শেষ হওয়ার পরও রোহিঙ্গা পরিবারটির গন্তব্যের খোঁজ মেলে না। পরিবারের প্রধান অটোচালকের সাথে কথা বলতে বলতে হঠাৎ তাঁদের এক আত্মীয়ের সাথে দেখা হয়ে যায়। এই সময়টা ক্ষণিকের জন্য খুব ভালো লেগেছিল আমার। মাথার ওপর তপ্ত রোদ নিয়ে চলছি তাঁদের আশ্রয়স্থল দেখতে। কিছুক্ষণ পর তাঁদের আশ্রয়স্থলে পৌঁছলাম। স্থানীয় মানুষের কাছে জানতে পারলাম–ক্যাম্পটির নাম ঘুনধুম, আলুগোলার মাঠ, টিভি সেন্টার, বালুখালী। হাজার হাজার অপুষ্ট-অসুস্থ মানুষের হাহাকার চারদিকে। প্রচণ্ড রোদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষায় থেকে কাড়াকাড়ি করে ত্রাণ নিচ্ছে মানুষ। একজন স্থানীয় মানুষের সহায়তায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অভাব-অভিযোগ শুনলাম। এখানে কোনো সমস্যাকেই নাম্বারিং করা যাচ্ছে না। সব সমস্যাই এক নম্বর সমস্যা। খাবার পানি এবং ক্যাম্পের বিভিন্ন দিক দেখার জন্য ঘুরছি স্থানীয় ছেলেটির সাথে। মানবতার ভয়াবহ পতনের চিহ্ন চারদিকে। শৌচাগারের অভাবে পাহাড়ের বিভিন্ন খোলা জায়গায় মল ত্যাগ করতে হচ্ছে শরণার্থীদের। দুর্গন্ধময় পরিবেশ হাজার হাজার মানুষকে বাধ্য হয়ে সইতে হচ্ছে। মানুষের বসবাস সেখানে অসম্ভব।

পায়ে হেঁটে, অটোতে করে বালুখালী থেকে টেকনাফের দিকে যাচ্ছি। প্রখর রোদ, অসম্ভব গরম। টেকনাফ রোডে মলিন চেহারার হাজারো শরণার্থীর আনাগোনা, ত্রাণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা, ত্রাণের আশায় দুর্বলদের পথের পানে চেয়ে থাকা। গাড়ি থামলেই তা ঘিরে ধরছে শত হাজার মানুষ। নারীরা অপুষ্ট শিশুসন্তান কোলে নিয়ে ত্রাণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে বালুখালী পানবাজার এলাকায় পৌঁছলাম দুপুরের খাবারের জন্য। হোটেলে মানুষের ভিড়, খাবার শেষ। বিস্কুট খেয়ে নিলাম। বাজারের জিনিসপত্রের দরদামের খোঁজ নিয়ে জানা গেল–আলু ২০ টাকা, পেঁয়াজ ৪৫ টাকা, কঁচুর গাডি ৪০ টাকা এবং প্রতিটি পরোটা ৫ টাকা। নতুন ক্যাম্পের খোঁজে টেকনাফের দিকে এগোতে থাকলাম। ত্রাণবাহী গাড়ির সাথে সাথে শরণার্থীদের আসা-যাওয়া করতে দেখছি। এগোতে

এগোতে অটো থেকে উনছিপ্রাং নামক স্থানে নেমে প্রধান সড়ক থেকে তিন-চার কিলোমিটার ভেতরে পাহাড়ে একটা ক্যাম্পের খোঁজ পেলাম। সেখানে কোনো যানবাহন চলাচল করতে দিচ্ছে না বিজিবি। তাই বাধ্য হয়ে হাঁটতে হচ্ছে কাদামাখা পথ। মানুষের চলাচল এবং ব্যবসায়িক ক্ষতির কারণে স্থানীয় মানুষদের বেশ বিরক্ত দেখলাম। মানুষ আর মানুষ, শিশুদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। চেহারায় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা স্পষ্ট। কাদায় মাখামাখি হয়ে থাকা পাকা-কাঁচা ভাঙ্গা পিচ্ছিল পথ পেরিয়ে টেকনাফের বুটিবুনিয়া শরণার্থী ক্যাম্পে হাজির হলাম বিজিবি চেক পোস্ট পার হয়ে। কয়েক দিন হলো এই ক্যাম্প করা হয়েছে। শরণার্থীরা পাহাড়ের সাথে সাথে সমতলের কৃষিজমিতে ঝুপড়ি বানিয়ে মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করেছে। এখানে প্রায় প্রত্যেকেই টাকার বিনিময়ে ঝুপড়ি করতে পেরেছে। ঝুপড়ির ভেতর অসম্ভব রকমের গরম, আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। পরিবারের পুরুষেরা ত্রাণের খোঁজে পথে পথে ঘুরছে। যে পরিবারে পুরুষ নেই সেই পরিবারে নারী বা শিশুরাই ত্রাণ সংগ্রহের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। অসুস্থতা এবং লোকের অভাবে অনেক পরিবারকে ত্রাণ সংগ্রহ করতে না পেরে না খেয়ে থাকতে দেখেছি। প্রায় সব ক্যাম্পেই গোসল এবং শৌচাগারের প্রকট সমস্যা দেখেছি। খাবার পানি সংগ্রহের অসম্ভব কষ্টকর নানা চেষ্টা দেখা গেছে। সেই পানি কতটুকু পানযোগ্য তা বলা খুব মুশকিল।

স্থানীয় দুজন মানুষের সাথে কথা বলে বুঝতে পারলাম, মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের প্রতি সহানুভূতি থাকলেও স্থানীয়দের জীবন ও জীবিকা নিয়ে তাঁরা চিন্তায় আছে। তবে এই অবস্থায় তাদের মধ্যে অনেকে আর্থিকভাবে লাভবানও হচ্ছে; যেমন–মুদি দোকানি, লন্ড্রি ইত্যাদি।

ক্যাম্পের মধ্যে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে মসজিদ, পানির জন্য ডোবা তৈরি হচ্ছে। আব্দুলাহ নামের ১৫-১৬ বছরের এক কিশোরের সাথে পরিচয় হলো। ও একটু একটু বাংলা বলতে এবং বুঝতে পারে। সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। আব্দুলাহর সাথে হাঁটতে হাঁটতে উনছিপ্রাং বাজারে এলাম। টেকনাফ রাস্তার পাশে বাজার। মানুষের আনাগোনা বেড়ে গেছে আগের চেয়ে। স্থানীয় দুজন মানুষের সাথে কথা বলে বুঝতে পারলাম, মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের প্রতি সহানুভূতি থাকলেও স্থানীয়দের জীবন ও জীবিকা নিয়ে তাঁরা চিন্তায় আছে। তবে এই অবস্থায় তাঁদের মধ্যে অনেকে আর্থিকভাবে লাভবানও হচ্ছে; যেমন–মুদি দোকানি, লন্ড্রি ইত্যাদি। স্থানীয় এই লোকদের পরামর্শে এবং আশপাশের লোকদের সাথে আলাপ করে রাত্রিযাপনের জন্য একটা হোটেলে উঠলাম। হোটেল ম্যানেজারের সাথে রোহিঙ্গা বিষয়ে আলাপ করে সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত পেলাম। হোটেলে রাতের খাবার খেলাম একটা ধর্মীয় রাজনৈতিক ত্রাণ দলের সদস্যদের পাশে বসে। তাঁদের নেতাদের আসা-যাওয়া এবং বাহন বিষয়ক আলোচনা শুনতে পেলাম। বিমানের সময় নিয়ে কথা হচ্ছে। রাত ১১-১২' টার দিকে মুষলধারে বৃষ্টির সাথে ঝোড়ো বাতাস মনটাকে ব্যথিত করে তুলল। হাজার হাজার মানুষ খোলা আকাশের নিচে এবং কোনো রকম ঝুপড়ি বানিয়ে তার ভেতর পরিবারের অসুস্থ মানুষদের নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে। বিদ্যুতের 'মহা উন্নয়নের' গল্পও শুনতে পেলাম হোটেল ম্যানেজারের কাছে। বিদ্যুতের অপেক্ষা করতে করতে ভ্যাপসা গরম এবং মশারি ছাড়া নোংরা পরিবেশের হোটেল ঘরে অস্বস্তি নিয়ে বিছানায় এলাম। ক্যামেরা ও মোবাইল চার্জের চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

এই ক্যাম্পের অনেক জায়গায় ক্যাম্প করার আগে ফসল ফলত। ফসল নষ্ট করে ক্যাম্প করার জন্য জমির মালিক শরণার্থীদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু কিছু করে টাকা নিয়েছে।

১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭। ইচ্ছা ছিল সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে বুটিবুনিয়া পাহাড়ের ক্যাম্পে ঝোড়ো বৃষ্টির প্রভাবে কী হয়েছে তা প্রত্যক্ষ করা। কিন্তু গতদিনের ভয়াবহ গরম এবং পাহাড়ি পথ হাঁটার ফলে শরীরটা একটু আরাম চাইছিল, তাই ঘুম থেকে উঠতে সকাল ৯টা বেজে যায়। নাশতা শেষে অটোতে করে বুটিবুনিয়া আসার পথে সীমান্তের ওপারে মিয়ানমারে ধোঁয়া দেখতে পাই। অটোতে মিয়ানমারের শরণার্থী এবং একজন স্থানীয় যাত্রী ছিল। তাঁর সাহায্যে জানতে পারলাম, গ্রাম পোড়ার ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। অটোচালকও জানাল একই কথা। অটোর শরণার্থী যাত্রীদের মধ্যে একজনের আর্থিক অবস্থা একসময় বেশ ভালো ছিল। মিয়ান-মার থেকে নিঃস্ব অবস্থায় বাংলাদেশে এসেছে। এদেশের একজন বন্ধু তাকে জোর করে তার হাতে পাঁচ হাজার টাকা গুঁজে দেয়। এই কাহিনিসহ তার কাছে আরও অনেক কথা বুঝতে পারলাম স্থানীয় মানুষটির কারণে। সব রকম পরিবহনে শরণার্থীদের ঢেউ।

বুটিবুনিয়া ক্যাম্প

অটো থেকে উনছিপ্রাং নামলাম। বুটিবুনিয়া ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য রাবারের স্যান্ডেলটা একটা কাঁচামালের দোকানের পাটাতনের নিচে রেখে গেলাম রাস্তায় কাদা এবং পিচ্ছিল বলে। সরু কাদাময় পিচ্ছিল রাস্তায় মানুষ আর মানুষ। সকলেই বাঁচার আশায় ছুটে চলেছে ত্রাণের খোঁজে। কেউ ছুটছে, কেউ কাদার মধ্যে ত্রাণের লাইনে দাঁড়িয়ে আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ত্রাণ সংগ্রহের কাজে শিশুদের সংখ্যাটা উল্লেখ করার মতো। অমানুষ সৃষ্ট সংকটে মনুষ্যত্বের পতন দেখতে দেখতে হাঁটছি পাহাড়ের ক্যাম্পের দিকে। দেখা হয়ে গেল বিজিবির ক্যাম্প কমান্ডারের সাথে। গতকালও তাঁর সাথে দেখা হয়েছিল। বিজিবির এক জোয়ান এক শিশুকে পানি পান করাচ্ছিল, সেই দৃশ্য আমার ক্যামেরায় ধারণ করায় কমান্ডার জোয়ানকে ধমক দিয়ে বললেন–কেন তোমরা এসব করো, জানো না ওপর থেকে নিষেধ আছে। কমান্ডারকে ক্যামেরার ছবি দেখিয়ে বললাম–তেমন কিছু তুলিনি, আপনার জোয়ান শিশুটিকে পানি পান করাচ্ছে, শুধু সেই ছবি তুলেছি। কমান্ডার বললেন–ঠিক আছে, যান যান। আজ তিনি নিজে থেকেই কুশল বিনিময় করে বললেন, কাল থেকে দেখছি আপনি কষ্ট করছেন, আপনার পরিচয়? আমি আমাদের সর্বজনকথার পরিচয় দিলাম। তিনি বললেন, আপনার নাম-ঠিকানা লিখে দিয়ে যান। আমি বললাম, ফেরার পথে দিয়ে যাব। তিনি বললেন, ঠিক আছে।

চলছি বুটিবুনিয়া ক্যাম্পের দিকে। গতকালের বৃষ্টিতে রাস্তা খুবই পিচ্ছিল হয়ে গেছে। এমন রাস্তায় শিশু-বৃদ্ধ, অসুস্থ মানুষগুলো চলাচল করছে জীবন বাঁচাতে। ১০-১২ মিটার ভাঙা রাস্তায় জমে থাকা পানির মধ্য দিয়ে চলাচল মানুষগুলোর জন্য খুবই কষ্টদায়ক ছিল, যা সামান্য উদ্যোগেই ঠিক করা যায়। পাশের শুকনো ক্ষেত দিয়ে আমি পার হলাম, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সেই সাহসটুকু করতে দেখলাম না। শিশু-বৃদ্ধ, সুস্থ-অসুস্থ সবাই কাদাপানির গর্ত দিয়েই চলাচল করছে, কারণ পাশেই বিজিবির অস্থায়ী তাঁবু। একজন বিজিবি জোয়ানকে

বললাম, এই গর্তটুকু আপনারাই তো ভরাট করে দিতে পারেন। উত্তরে সে বলল, খুব শিগগিরই রাস্তা ঠিক হয়ে যাবে। আজ পর্যন্ত রাস্তা ঠিক হয়েছে কি না জানি না। পথিমধ্যে হোসেন আল-ফয়সাল নামের স্থানীয় এক যুবকের সাথে দেখা হলো। সে আমাকে পিচ্ছিল কাদাময় পথ পেরিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে দিতে বেশ সাহায্য করে। ফয়সাল পাহাড়ের নিচে সমতল জমিতে ধান চাষ করে। সে জানাল, এই ক্যাম্পের অনেক জায়গায় ক্যাম্প করার আগে ফসল ফলত। ফসল নষ্ট করে ক্যাম্প করার জন্য জমির মালিক শরণার্থীদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু কিছু করে টাকা নিয়েছে।

জীবনের প্রথম জোঁকের কামড় খেলাম। জোঁককে আমি ভীষণ ভয় পেতাম, কিন্তু আজ কামড় খাওয়ার পরও একেবারেই ভয় কাজ করেনি। রোহিঙ্গা এক শিশু আমার পা থেকে ওর হাত দিয়ে জোঁকটা সরিয়ে ফেলল। বুটিবুনিয়া ক্যাম্পের সর্বশেষ প্রান্ত দিয়ে সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টায় উঠলাম শরণার্থী ক্যাম্পটার পুরো দৃশ্য দেখব বলে। পাহাড়ে উঠতে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ ঝুপড়ি চোখে পড়ল। পাহাড়ের চূড়ায় দুই রোহিঙ্গা পরিবারের ঝগড়া দেখতে পেলাম। স্থানীয় ছেলে ফয়সাল সেই ঝগড়া মেটাতে সাহায্য করল। পাহাড়ের চূড়ায় এক রোহিঙ্গা পরিবারের সাথে পরিচয় হলো। পরিবারের পুরুষ লোকটি মোটামুটি ভালোই বাংলা বোঝে এবং বলতে পারে। সে পরিবারের শিশুসন্তানদের দেখলাম প্রায় এক হাজার ফুট নিচে পাহাড়ের ঝিরি থেকে বোতলে করে পানি নিয়ে পাহাড়ে উঠছে। বাচ্চা দুটোকে অসম্ভব ক্লান্ত লাগল। এসব দৃশ্য দেখতে দেখতে পাহাড়ের নিচে নামছি আর মানুষের বেঁচে থাকার প্রাণপণ লড়াই দেখছি। প্রতিটি শরণার্থী পরিবার তাদের অভাবের কথা আমাকে বলছে। কেউ তাঁদের নাম লিখে নিতে বলছে, কেউ অসুস্থতার কথা বলছে, কেউ ওষুধ চাইছে, কেউ পলিথিনের কথা বলছে। এমন অভাবের কথা শুনতে শুনতে পাহাড় থেকে নামছি। পথিমধ্যে দুজন স্কুলপড়ুয়া স্বেচ্ছাসেবকের সাথে দেখা হলো। তাঁরা বেশ কয়েক দিন ধরে শরণার্থীদের সেবা দিয়ে যাচ্ছে বলে জানাল। প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য যৌথভাবে একটা ডোবা তৈরি করতে দেখলাম। পাশেই এক শিশু পাহাড়ের গা বেয়ে নামা পানি সংগ্রহের ধৈর্য্যের বিরাট পরীক্ষা দিচ্ছে। জীবনের চরম পরাজয় দেখছি আর নামছি।

পাহাড়ের নিচের ক্যাম্পের পাশের গলিগুলো কাদায় একাকার। সুস্থ মানুষেরই চলাফেরা যেখানে অসম্ভব, সেখানে রোগাক্রান্ত, অপুষ্ট, অসুস্থ মানুষদের কষ্ট সহ্য করার মতো নয়। ক্যাম্পের ভেতর ছোট ছোট দোকান বসেছে। এসব দোকানে কাঁচামালসহ প্যাকেটজাত খাবার পাওয়া যায়; যদিও পরিমাণে খুব কম। এসব দোকানের কাঁচামাল স্থানীয় বাজার থেকে কেজিতে পাঁচ-ছয় টাকা বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। কারণ বাজার থেকে এখানে আনতে একটা খরচ হয়। ক্যাম্পের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলা ছোট আকারের একটা খালের ওপর গতকাল শরণার্থীরা একটা বাঁশের সাঁকো বানিয়েছিল। গতকালের ঝড়ে সেটা ভেঙে গিয়ে মানুষের পারাপার অসম্ভব ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। অনভ্যস্ত আমাকেও ক্যামেরা নিয়ে খুব কষ্ট, ঝুঁকি নিয়ে পার হতে হয়েছে। আকাশে মেঘ করেছে। আকাশের মেঘ দেখে এক শরণার্থী মা তাঁর বেড়াহীন ঝুপড়ির জিনিসপত্র বৃষ্টির পানি থেকে বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন একাই। তাঁর স্বামী ত্রাণের জন্য বেড়িয়েছেন সেই সকালে। এ অবস্থায় মানুষের কষ্ট ক্যামেরাবন্দি করার চেষ্টা করলাম। কাউকে কাউকে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করতে দেখা গেল। বৃষ্টির মধ্যেই সেই ভাঙা রাস্তা পাড়ি দিচ্ছে অসংখ্য মানুষ। বৃষ্টি থামার পর রওনা হলাম টেকনাফ-কক্সবাজার বালুখালী ক্যাম্পের দিকে। উনছিপ্রাং স্কুলের সামনে কাদাপানির মধ্যে ত্রাণের জন্য হাজার মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে ত্রাণ সংগ্রহ করছে। কেউ কেউ পুরনো কাপড় থেকে বেছে বেছে কাপড় সংগ্রহ করছে।

উনছিপ্রাং থেকে বালুখালী আসার পথে শত শত শরণার্থীকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। কোথাও কোথাও ছোটবড় ত্রাণের গাড়ি থেকে ত্রাণ বিতরণ করা হচ্ছে। খালি পা, পিঠে শিশু, কারো কারো পিঠে বৃদ্ধ মা-বাবা, সবাই হেঁটে চলেছে অজানার উদ্দেশে। রাস্তার বহু জায়গায় পুরনো কাপড় পড়ে থাকতে দেখা গেল। চারপাশে কেবল মানুষ আর মানুষই দেখা যাচ্ছিল। মানুষের চাপে কক্সবাজার-টেকনাফের প্রধান সড়কে যানজট লেগে যাচ্ছে প্রায়ই। পালংখালী ক্যাম্পের আশপাশের শরণার্থীদের ছবি ও খোঁজখবর করার সময় স্থানীয় এক ছেলে আমাকে সাংবাদিক ভেবে শরণার্থীদের ও তাদের সমস্যার কথা বলতে লাগল। তাঁর সাথে কথা বলছি আর হাঁটছি, ছবি তুলছি। রাস্তার পাশেই একটা পাহাড়ে উঠলাম। পাহাড়ে বসতি স্থাপন করছে শরণার্থীরা। পাহাড়ে বড় গাছ কাটা এবং নতুন রোপণ করা চারাগাছ–দুই-ই দেখলাম। কাটা গাছ দেখে বোঝা গেল, গাছগুলো অনেক আগে কাটা হয়েছে এবং এই গাছ প্রাকৃতিক গাছ নয়, রোপণ করা বিদেশি গাছ। যে চারাগাছ দেখা যাচ্ছে, তা-ও বিদেশি জাতের। যেসব গাছ কেটে শরণার্থীরা তাঁদের থাকার জায়গা তৈরি করছে, সবই চারাগাছ এবং সবই বিদেশি। ওইসব পাহাড়ে খোঁজখবর নিতে গিয়ে জানতে পারি, স্থানীয় মানুষ ও শরণার্থী-দের মধ্যে পাহাড়ে বসতি স্থাপন নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে। স্থানীয় দরিদ্র পাহাড়ের মালিক বলে দাবিদার এক নারী বলছে–অনেক কষ্ট করে, মোড়া বিক্রি করে, খেয়ে না খেয়ে এই পাহাড়টুকু কিনেছি। এখানে কোনোভাবেই রোহিঙ্গাদের বসত করতে দেব না। আরেকজন জানাচ্ছে–ভিক্ষা করে এই জায়গাটুকু কিনেছি, এটা চলে গেলে আমরা কী করে খাব! তাঁদের মধ্যে রীতিমতো ঝগড়া হচ্ছে। শরণার্থীদের কথা–আমরা তো এখানে ঝুপড়ি বানানোর জন্য আসিনি। আমাদের স্থানীয় অমুক ভাই দেখাইয়া দিছে, উনার কথায় আমরা এখানে বসতি করছি। শরণার্থীরা তাদের অমানবিক দুঃখকষ্টের কথা বলে স্থানীয়দের বোঝানোর চেষ্টা করছে। এরই মধ্যে এক টিভি সাংবাদিককে দেখতে পেয়ে তাঁকে বিষয়টা দেখার অনুরোধ করলাম। পাহাড়ের অন্য দিকে কিছু লোককে দড়ি দিয়ে সীমানা নির্ধারণ করতে দেখলাম। দড়ির সীমানার ওপারে যাতে কোনো শরণার্থী বসতি করতে না পারে তার জন্য এই ব্যবস্থা।

পাহাড়গুলো শরণার্থীদের বসতি স্থাপনের আগেই ক্ষতবিক্ষত হয়ে

বাস থেকে নেমে যে অবস্থা আমার চোখে পড়ল, তা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। হাজার হাজার মানুষ অজানার পথে হাঁটছে। বহু মানুষ ত্রাণের গাড়ির পেছন পেছন ছুটছে ত্রাণের আশায়। রাস্তার দুই ধারে মানুষ আর মানুষ। শিশু-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ। অসুস্থ মানুষ রাস্তার ধারে পড়ে আছে। অনেক অসুস্থ মানুষ আবার আরেকজনের সাহায্য নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছার চেষ্টা করছে। এক শিশু আরেক শিশুকে কোলে নিয়ে প্রাণপণে আশ্রয়ের খোঁজে ছুটে চলছে। অনেকেই পরিবারের লোকজন নিয়ে রাস্তার পাশে বসে আছে।

আছে। পাহাড়ে বিদেশি গাছ লাগিয়ে গাছের ব্যবসা আর পাহাড় কেটে মাটি ও পরে জমির ব্যবসা চলছে আগে থেকেই। এর নজির চারপাশে বিদ্যমান। কাটা পাহাড়ের পাদদেশে অনেক শরণার্থী ঝুপড়ি বানিয়ে বসবাস করছে। পানির বড়ই অভাব। তাই নোংরা পানিতে মা তার সন্তানকে শরীর ধোয়াতে কোনোই কুণ্ঠা বোধ করছে না। কাটা পাহাড়ের পাদদেশে বসতি স্থাপনকারী শরণার্থীরা খুব ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছে। ভারি বৃষ্টিতে যে কোনো সময় পাহাড় ধ্বস হয়ে তারা মারা যেতে পারে। পড়ন্ত বিকেলে পাহাড় কাটা জমির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলার সময় ক্যাম্পের ভেতর স্থানীয় নতুন স্থাপন করা বাজারের জিনিসপত্রের দাম জানতে চাইলাম। আগের বাজারের মতো কেজিতে পাঁচ-ছয় টাকা বেশিতে জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে। শরণার্থী এবং স্থানীয়–উভয় মানুষই বিক্রেতা। সাজগোজ করা কয়েকজন নারীকে দেখে একটু এগিয়ে কথা বলার চেষ্টা করলাম, বলতে চাইলাম আশপাশের দুষ্ট লোক থেকে সাবধান। কিন্তু তাঁরা একটু অস্বাভাবিক আচরণ করল এবং আমার কথা শুনতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল না।

ছবিঃ ত্রাণবাহী ট্রাকের পেছনে মানুষের ছুটে চলা

শরণার্থীদের অনিশ্চিত জীবন দেখতে দেখতে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে এক বাড়িতে পানি পানের জন্য গেলাম। বাড়ির বধূ রোহিঙ্গা। কয়েক বছর আগে তাঁর এখানে বিয়ে হয়েছে। ক্যাম্পের সাথের এই বাড়িতে সে কয়েকজনকে আশ্রয় দিয়েছে। তাঁদের সবার ছবি তুলতে চাইলাম। শরণার্থী আত্মীয়রা রাজি হলেও বাড়ির বধূ রাজি হলো না। ধন্যবাদ দিয়ে চলে এলাম। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। চারদিকে মানুষের ছোটাছুটি। ঝুপড়ির ভেতর থেকে রান্নার ধোঁয়া দিয়ে চারদিক ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে আছে। রাস্তার পাশে ছোট ছোট দোকান উঠেছে। স্থানীয় একজন পাকা করে নতুন দোকানঘর তৈরি করছে নিজেই ব্যবসা করার জন্য। ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে কাদামাখা পথে হাজার হাজার শরণার্থী ঝুপড়িতে ফিরছে–কেউ ত্রাণ নিয়ে, কেউ বাজার নিয়ে, কেউ বা পানি নিয়ে। অনেকেই পাশের ধানক্ষেতে মলমূত্র ত্যাগ করছে। স্যানিটেশনের জন্য একটা ভ্যানে করে সিমেন্টের চাকা আনতে দেখা গেল।

ছবিঃ অপরিষ্কার উৎস হতেই খাবার পানি সংগ্রহের আপ্রাণ চেষ্টা

কথা হয় ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় এক নেতার ছেলে ইরফানের সাথে। সে জানাল, এই ক্যাম্প পরিচালনার জন্য একটা কমিটি করা হয়েছে তাঁদের তত্ত্বাবধানে। তাঁর কথা অনুযায়ী, তাঁরা ইতোমধ্যেই ৪০টি টিউবওয়েল, ২০টি গোসলখানা তৈরি করে দিয়েছে। আরও ৫০টি টিউবওয়েল ও ১০-১৫টি গোসলখানা তৈরি করবে শিগগিরই। রাস্তার পাশে একজন লোককে নগদ অর্থ বিতরণ করতে দেখা গেল। তাঁর পেছন পেছন অনেক মানুষ ছুটছে অর্থ পাওয়ার আশায়। লোকটাও অর্থ বিতরণ করতে হিমশিম খাচ্ছে। অনেক জায়গায় প্যাকেট করা খাবার বিতরণের দৃশ্য দেখা গেল। বিদ্যানন্দ নামের একটি সংগঠন রান্না করা রাতের খাবার বিতরণ করছে বেশ কিছুদিন ধরে। কক্সবাজার শহর থেকে রান্না করে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই শরণার্থী শিবিরে খাবার বিতরণ করা হচ্ছে বলে জানাল সংগঠনের একজন। শত শত নারী-পুরুষ, বিশেষ করে শিশুদেরকে লাইন ধরে খাবার সংগ্রহ করতে দেখা গেল।

শরণার্থী শিবিরের অনেক ঝুপড়িতে সৌরবিদ্যুতের আলো জ্বলছিল। আশ্রয় শিবিরের ঝুপড়িগুলোতে রাতের বেলা মানুষ কিভাবে থাকছে তা দেখার জন্য ঝুপড়ির ভেতরে ঢুকলাম। এক ঝুপড়ির মানুষের পাহাড় সমান দুঃখের কথা শুনতে না শুনতে আরেক ঝুপড়ির মানুষ আহ্বান করে বলছে–আমার এখানে এসে দেখে যান আমরা কী সমস্যায় আছি। প্রতিটি পরিবারে অসংখ্য অপুষ্ট মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি। প্রত্যেকেই আমার কাছে তাদের দুঃখকষ্টের কথা বলে সাহায্য-সহযোগিতার প্রত্যাশা করছে। অবস্থা এমন যে আমি আমার অক্ষমতার কথাও তাদের কাছে প্রকাশ করতে

পারছি না। এককথায় বললে আমি বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। ফেরার পথে এক ঝুপড়ির ভেতর চোখ চলে যায়। দোচালা ঘরের মতো এক ঝুপড়ির ভেতর রান্না হচ্ছিল, পুরো ঘর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। এর ভেতর ক্ষুধার্ত শিশুদের মধ্যে কেউ ঘুমাচ্ছে, কেউ জেগে আছে খাবারের আশায়।

শরণার্থী শিবির থেকে ফিরতে বেশ সমস্যা হচ্ছিল। অচেনা পিচ্ছিল অন্ধকার পথ, এক পাও সামনে ফেলা যাচ্ছিল না। আমার এ অবস্থা দেখে পঞ্চাশোর্ধ্ব একজন মানুষ আমার হাত ধরে কাদাময় পথ পাড়ি দিতে সাহায্য করল। প্রধান সড়কে এসে তার হাতে ২০০ টাকা গুঁজে দেয়ার সময় জানলাম, সে স্থানীয়। এর আগে আমি তাকে শরণার্থীদের একজন ভেবেছিলাম। পালংখালীর এই জায়গার অবস্থা দেখে খোঁজ করার চেষ্টা করলাম শরণার্থীদের আসার আগে এখানে কেমন লোকসমাগম হতো। জানতে পারলাম, বর্তমানের ৫০ ভাগের এক ভাগ লোক দেখা যেত। গাড়ির লাইটের আলোতে রাস্তার ওপারে কিছু মানুষকে দেখা গেল। কাছে গিয়ে জানতে পারলাম, টাকার অভাবে তারা ক্যাম্পে উঠতে পারছে না। কাছাকাছি এক স্থানীয় লোককে ডেকে হাতে হাজারখানেক টাকা দিয়ে বিশেষভাবে অনুরোধ করলাম, যাতে এই পরিবারটিকে কাছাকাছি কোনো এক ক্যাম্পে স্থান করে দেয়। শরণার্থীদের কথা এবং লোকটার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলার পর তাঁর ওপর ভরসা করে টাকাটা তাঁরই হাতে দিই। তখন রাত ৮টা। ১১টার বাসে ঢাকা ফিরতে হবে। পালংখালী থেকে কোট বাজারের উদ্দ্যেশে অটোরিকশায় উঠলাম। তখনও রাস্তার ধারে বহু জায়গায় অসংখ্য শরণার্থীকে, বিশেষ করে কোলে শিশুসন্তানসহ নারীদের ত্রাণের আশায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। কয়েক জায়গায় রাতেও ত্রাণ বিতরণ হতে দেখলাম।

অটোতে প্রথম পুলিশের তল্লাশির মধ্যে পড়লাম। রোহিঙ্গারা যাতে নির্দিষ্ট এলাকা থেকে বের হতে না পারে, তাই এ তল্লাশি হচ্ছে বলে জানতে পারলাম। কোট বাজার থেকে কক্সবাজারের উদ্দ্যেশে ভাগের সিএনজি অটোরিকশা করে রওনা দিলাম। তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর জন্য ৭০ টাকার ভাড়া ১০০ টাকা দিতে হলো। কোট বাজার থেকে মেরিন ড্রাইভের পথে দুইবার পুলিশের এবং একবার বিজিবির তল্লাশির মধ্যে পড়তে হলো। বিজিবির তল্লাশিটা পুলিশের চাইতে শিথিল ছিল। রাত প্রায় সাড়ে ১০টায় কক্সবাজার পৌঁছলাম। হোটেলে রাতের খাবার খেয়ে বাসে উঠলাম ঢাকার উদ্দ্যেশে। আমার পাশের সিটে একজন তরুণ ছেলে ছিল। বেশ কিছুক্ষণ বাস চলার পর আবার পুলিশের তল্লাশির মধ্যে পড়লাম। আমি শুয়েই ছিলাম। পুলিশ পাশের সিটের ছেলেটাকে বেশ প্রশ্ন করল। তল্লাশিটা বেশ শক্তপোক্ত মনে হলো। বাসের এফ নম্বর চাকার ওপরের সিটে বসার কারণে দেশের হাইওয়ে সম্পর্কে একটা অভিজ্ঞতাও হয়ে গেল আসার সময়। যাওয়ার সময় আরও ভয়াবহ অবস্থা হয়েছিল। কারণ তখন ছিলাম একেবারে পেছনের সিটে।

দুই দিনে অসহায় নিপীড়নের শিকার, নিজভূমে মর্যাদাহীন অধিকারহারা মানুষ সম্পর্কে জানা-বোঝা খুবই দুরূহ কাজ। চেষ্টা করেছি হৃদয় দিয়ে তাঁদের দুঃখকষ্ট অনুভব করতে। কিন্তু আমি যে তাঁদের চেয়ে অনেক ভালো আছি, আমার অবস্থান থেকে কী করে তাঁদের অবর্ণনীয় যন্ত্রণার কথা মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারি! মানুষের এমন পরাজয় আমি এর আগে কখনও দেখিনি, এমনকি শুনিওনি। যখনই সেইসব মানুষ, বিশেষ করে শিশুদের কথা মনে পড়ে তখন কোনোভাবেই এ অবস্থা মেনে নিতে পারি না। রোহিঙ্গা শরণার্থী জীবন দেখে আসার পর একটা ভয়াবহ মানসিক যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। কোনোভাবেই আমি মানুষের এই জীবন একটি মুহূর্তের জন্যও চাই না।

মিজানুর রহমান: সর্বজন কর্মী। সর্বজনকথার সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য।
ইমেইল: mizanppm@gmail.com

ছবিঃ শরণার্থী ক্যাম্পের জীবন